রায়রামানন্দ ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-সময়ে গোদাবরীতীরে রায়রামানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় রায়রামানন্দ বক্তা এবং প্রভু শ্রোতা।

চতুর্ব্বর্গ। আমাদের অভীষ্ট বস্তুকেই আমরা পুরুষার্থ বলি এবং এই পুরুষার্থই আমাদের সাধ্য। পুরুষার্থ-নামক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, আমাদের পুরুষার্থ পাঁচটী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং পঞ্চম এবং পরম-পুরুষার্থ প্রেম। আমাদের একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে বলিয়া সুখ চাই এবং দুঃখ চাই না। সুতরাং সুখই হইল আমাদের প্রধান এবং মুখ্য কাম্যবস্তু; আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিও কাম্য। উক্ত প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের বাস্তব পুরুষার্থতাই নাই; যেহেতু, এই ত্রিবর্গদ্বারা আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না, নিত্য সুখও পাওয়া যায় না। ইহাও বলা হইয়াছে যে, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি এবং নিত্য ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি হয় বলিয়া মোক্ষের (সাযুজ্যমুক্তির) বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে বটে; কিন্তু মোক্ষও মুখ্য পুরুষার্থ নহে; যেহেতু, মুক্তজীবদিগেরও পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমের জন্য লোভ দেখা যায়।

চতুর্ব্বর্গ অজ্ঞানতম। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চতুর্ব্বর্গকেই অজ্ঞান-তম—কৈতব বলিয়াছেন। "অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ১।১।৫০-৫১॥" এস্থলে চতুর্ব্বর্গের বাসনাকেই অজ্ঞান-তম এবং কৈতব বলা হইয়াছে। অজ্ঞান বলিতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব বুঝায়। এই অভাবই তমঃ বা অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারে যেমন কেহ কিছু দেখিতে পায় না, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাববশতঃ আমরাও তেমনি আমাদের চিরন্তনী সুখ-বাসনার চরমাতৃপ্তি কোথায়, তাহা দেখিতে পাইনা। তাই সাক্ষাতে যাহা কিছু দেখি, তাহাকেই আমাদের সুখ বা সুখ-সাধন বস্তু মনে করিয়া বঞ্চিত হই—ইহাই কৈতব বা আত্ম-বঞ্চনা।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাববশতঃ আমাদের নিজের স্বরূপের জ্ঞানও আমাদের নাই; তাই আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে; কারণ, দেহকেই সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ দেখি। দেহের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে করি এবং তাহাতে কেবল বঞ্চিতই হই। যেহেতু, দেহের সুখ স্বরূপতঃ আমার নিজের সুখ নয়; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে সুখবাসনার চরমাতৃপ্তিই হইত; কিন্তু তাহা হয় না। এই দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই দেহের সুখসাধন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের পশ্চাতে আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বিচার করিয়া যদিও বুঝি, ইহারা আমাদের কাম্য নিত্য-সুখ দিতে পারিতেছে না, তথাপি ইহাদের আপাতঃ-রমণীয়তাতে মুগ্ধ হইয়া আমরা ইহাদিগকে ছাড়িতে পারিতেছিনা এবং অন্য উপায়ের সন্ধানও করিতে পারিতেছিনা। গাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকারের ন্যায়, নিত্যসুখ-সাধন অন্য উপায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকেই যেন ইহারা প্রতিহত করিয়া দিতেছে। তাই এই ত্রিবর্গ অজ্ঞান-তমঃ এবং কৈতব। বস্তুতঃ আমাদের দেহাবেশই দৈহিক সুখের আপাতঃ-রমণীয়তায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া নিত্যসুখ-সাধন-উপায়ের প্রতি আমাদের অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে; ত্রিবর্গ তাহার আনুকূল্য করিতেছে। এই দেহাবেশও অজ্ঞান-তমঃ এবং কৈতব।

মোক্ষে (সাযুজ্যমুক্তিতে) দেহাবেশ নাই; সুতরাং দেহাবেশ-রূপ তমঃ মোক্ষে নাই। কিন্তু মোক্ষেও জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব আছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। মোক্ষে এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব; যেহেতু মোক্ষাভিসন্ধিৎসু সাধক জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান পোষণ করেন। এই ঐক্যজ্ঞানই সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী এবং মুক্তজীবের প্রকৃত-সম্বন্ধজ্ঞানকে সম্যক্ রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, প্রকাশ হইতে দেয় না। তাই মোক্ষ-বাসনাও অজ্ঞান-তমঃ। আর মোক্ষপ্রাপ্ত জীব বৈচিত্র্যহীন আনন্দসত্ত্বামাত্ররূপ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া তাহাকেই চরমতম কাম্য মনে করিয়া পরম-লোভনীয়

প্রেমানন্দের কথা চিন্তা করিবার অবকাশও পায় না; সুতরাং কোটিব্রহ্মানন্দতুচ্ছকারী প্রেমানন্দের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সাধকও ঐ ব্রহ্মানন্দের লোভেই প্রেমানন্দের কথা চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না; সুতরাং প্রেমসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। তাই মোক্ষ বা মোক্ষ-বাঞ্ছাও কৈতবতুল্য।

মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। ত্রিবর্গলভ্য সুখের লোভে যাঁহারা সংসারে গতাগতি করেন, কোনও ভাগ্যে কোনও সময়ে হয়তো তাঁহাদের ভক্তির কৃপা লাভের সৌভাগ্য হইতে পারে; প্রেমসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদের আছে। কিন্তু মোক্ষ লাভ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইবেন, পূর্ব্বভক্তিবাসনা না থাকিয়া থাকিলে, তাঁহাদের আর তদ্রূপ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। তাই মোক্ষ-বাঞ্ছাকে "কৈতব-প্রধান" বলা হইয়াছে। সাধনের সময়ে কোনও সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের ভক্তিবাসনা জন্মে, নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান-সাধনের অপরিহার্য্যা সহায়কারিণীরূপে সাধন-কালে তাঁহারা যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মুক্তাবস্থায় সেই ভক্তিই পূর্ব্বভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ আবরণকে দূরীভূত করিয়া পরম-পুরুষার্থ প্রেমের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং প্রেমসুখের পরমলোভনীয়তায় ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ মনে করিয়া তাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" কিন্তু এই সৌভাগ্য যাঁহাদের নাই, তাঁহারা "কৈতবেই" থাকিয়া যান।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের পুরুষার্থতা নাই।

পরমধর্ম্ম। যাহা হইতে "কৈতব" সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ধর্ম্মকেই "পরম-ধর্ম্ম" বলা হইয়াছে। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি॥ ১।১।২॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—"প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।—এই শ্লোকে প্রোজ্‌ঝিতকৈতব-শব্দের অন্তর্গত প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধানকেও নিরস্ত করা হইয়াছে।" অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, যে ধর্ম্মে মোক্ষ-বাসনা থাকিবে, সে ধর্ম্মও পরম-ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী মোক্ষ-শব্দে কেবল সাযুজ্যমুক্তিকেই লক্ষ্য করেন নাই; পরন্তু সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যাহাতে এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তির প্রতি লক্ষ্য থাকিবে, তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহার কারণ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হইতে পারে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম। সাযুজ্যমুক্তি-বাসনায় এই জ্ঞান যে মোটেই বিকশিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্য চারি রকমের মুক্তিবাসনাতেও সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাব উদ্বুদ্ধ হয় বটে; কিন্তু সালোক্যাদি প্রাপ্তির বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনা গৌণ হইয়া পড়ে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের দুইটী অঙ্গ—সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনার জ্ঞান। দুইটীর সম্যক্ বিকাশেই সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ। সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ হইলে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্যই বাসনা থাকে না; নিজের জন্য কোনও অনুসন্ধানের ছায়াও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবায় স্থান পায় না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সালোক্যাদির বাসনা প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া, অন্ততঃ সেবা-বাসনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে বলিয়া, তাহাতে যে সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এজন্যই শ্রীজীবগোস্বামী পঞ্চবিধামুক্তির যে কোনও মুক্তিবাসনাকেই পরম-ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়াছেন।

সাধ্যবস্তু। ইহাতেও জানা গেল—ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, পঞ্চবিধা মুক্তিরও পুরুষার্থতা নাই। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, একমাত্র পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমেরই পুরুষার্থতা আছে; যেহেতু, প্রেমে সেব্য-সেবকত্বের ভাব তো জাগ্রত হয়ই; অধিকন্তু, সেবার ভাবও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়,—স্বসুখ-বাসনা-গন্ধলেশশূন্যা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা সম্যক্‌রূপে উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়া। সুতরাং পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমই হইল মুখ্য সাধ্য

বস্তু। পরম-ভাগবতোত্তম রায়রামানন্দের মুখ হইতে এই মুখ্য সাধ্যবস্তুটীর কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। ২।৮।৫৪॥—রামানন্দ! সাধ্যবস্তু কি, তাহা বল; এবং যাহা বলিবে, তাহার সমর্থক প্রমাণও দিবে।"

রামানন্দরায় কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটী বলিলেন না। প্রেমই পরমপুরুষার্থ, পরম সাধ্য বস্তু, একথা প্রথমেই—বলিলেন না। বলিলে দেহাত্মবুদ্ধি-আমরা তাহা হয়তো গ্রহণ করিতাম না। দেহের সুখকেই আমরা পরম সাধ্যবস্তু বলিয়া মনে করি। আমাদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই পরম-করুণ রায়রামানন্দ একেবারে প্রথম পুরুষার্থ "ধর্ম্ম"-হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমশঃ মোক্ষের (জ্ঞানমিশ্রাভক্তির) কথাও বলিয়াছেন। এইরূপে চতুবর্গের কথা শেষ করিয়া সর্ব্বশেষে পঞ্চমপুরুষার্থের অবতারণা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের কথা না বলিয়া অন্য পুরুষার্থের কথা বলিয়াছেন, সে পর্য্যন্তই প্রভু কেবল "এহো বাহ্য, এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। যখন প্রেমের কথা আরম্ভ করিলেন, তখন বলিলেন "এহো হয়।" প্রেমের সহিত যে সেবা, সেই সেবারও অনেক স্তর আছে। রায়রামানন্দের মুখে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তরের কথা প্রকাশ করাইয়া প্রভু সর্ব্বশেষে "সাধ্যবস্তুর অবধির" কথা প্রকাশ করাইলেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা রায়রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার ভূমিকা-স্বরূপ। এই ভূমিকাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা, উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। বিস্তৃত আলোচনা মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

স্বধর্ম্ম। রায়মহাশয় প্রথমেই বলিলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা। "রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥" ইহা প্রথম পুরুষার্থ ধর্ম্মের কথা। ইহা পরম-ধর্ম্ম নয়; ইহা দেহাবেশের কথা, তাই ইহার পুরুষার্থতাই নাই। প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ। দ্বিতীয় কথা—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥" ইহাও প্রথমপুরুষার্থ ধর্ম্মেরই আর একটা দিক। ইহাতেও দেহাবেশ। কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ।" ইহারও পুরুষার্থতা নাই। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর॥"

স্বধর্ম্ম-ত্যাগ। তার পরের কথা—"স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্যসার॥" ইহাতে প্রথমপুরুষার্থ-ধর্ম্মের ত্যাগের কথা থাকিলেও ইহাতে সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনা নাই। এই উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ গীতা হইতে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"—শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ। কিন্তু প্রভু ইহাকেও বলিলেন "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" সাধারণ দৃষ্টিতে প্রভুর এই উক্তিকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ গীতার এই চরম কথাকে "সর্ব্বগুহ্যতম পরম-বাক্য" বলিয়াছেন। "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ো শৃণু মে পরমং বচঃ।" ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত অপেক্ষাও ইহা পরম-রহস্যময়। এই পরমরহস্যময় বাক্য যাহার-তাহার নিকটে বলা যায় না। অর্জ্জুন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। "ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥" এমন পরম-রহস্যময় এবং গীতার সারভূত কথাকেও প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য।"

ইহার হেতু এই। এই গীতাশ্লোকে যে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের কথা আছে, সেই ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়, শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভবশতঃ অন্য সমস্ত ধর্ম্মের ফলের অকিঞ্চিৎকরতা-বুদ্ধিজাতও নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দিতেছেন, তাই এই ত্যাগ; তথাপি কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মত্যাগজনিত পাপের আশঙ্কাও যেন আছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিতেছেন—"পাপের জন্য ভয় করার হেতু নাই, সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত ধর্ম্ম নির্ভয়ে ত্যাগ করিতে পার।" ইহাতে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের দেহাবেশের পরিচয়ও পাওয়া যায়, দেহাবেশ না থাকিলে পাপের ভয় জন্মিতে

পারে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাবেশ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নই থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরম-পুরুষার্থ প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব নয়। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। ইহার পরে রামানন্দরায় বলিলেন—"জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার।" এই উক্তির সমর্থনে তিনি গীতার "ব্রহ্মভূতো প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥১৮।৫৪॥" শ্লোকের উল্লেখ করিলেন।

এস্থলে ভগবানে পরাভক্তির কথা বলা হইল। পরাভক্তিই কিন্তু প্রেমভক্তি—সুতরাং পঞ্চম-পুরুষার্থ, সাধ্য। তথাপি প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" কিন্তু কেন?

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় প্রভুর "এহো বাহ্য"-এই উক্তি সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"এহো বাহ্য ইতি। অত্র শোকাদিবিঘ্নসত্ত্বে ভজনাপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানাপেক্ষা তদ্‌ভাবেতু সা পুনর্ভজনবিঘ্ন এবেতি বাহ্যম্।—শোকাদি-বিঘ্ন থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা; কিন্তু জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলে শুদ্ধাভক্তিমার্গে ভজনের বিঘ্ন জন্মে; তাই প্রভু বাহ্য বলিয়াছেন।" চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে রামানন্দরায়প্রোক্ত "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি"-শব্দের অন্তর্গত "জ্ঞান" এর কথাই বলিতেছেন। এই জ্ঞানকে তিনি "ভজনবিঘ্ন"—ভজনের বিঘ্নজনক বলিতেছেন, "ভজনবিরোধী" বলেন নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, এই জ্ঞানকে তিনি জীবতত্ত্ব-ভগবতত্ত্ব-মায়াতত্ত্বাদির জ্ঞান বলিয়াই মনে করেন, জ্ঞানমার্গের সাধকের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান মনে করেন না; যেহেতু, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই সেব্য-সেবকত্বভাবের প্রতিকূল বলিয়া ভক্তিমার্গের ভজনবিরোধী। শ্রীপাদচক্রবর্ত্তী এস্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ ১।২।১২০॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"জ্ঞানমত্র ত্বম্পদার্থবিষয়ং তৎপদার্থবিষয়ং তয়োরৈক্যবিষয়ঞ্চেতি ত্রিভূমিকং ব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে। তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তচ্চ প্রথমমেবেত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়তে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তদ্‌ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাচ্চ॥—অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় অন্যবস্তুতে চিত্তের আবেশ (এবং তজ্জনিত শোকাদিবিঘ্ন) দূর করার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী (জীবতত্ত্ব-ভগবতত্ত্বাদিবিষয়ক) জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে-প্রবেশ-লাভ হইলে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই; তখন এসমস্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। বিশেষতঃ, তখন বৈরাগ্যের কথা, কি জীবতত্ত্ব-ভগবতত্ত্বাদির কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তির বিঘ্ন জন্মে।"

এক্ষণে বুঝা গেল, চক্রবর্ত্তিপাদের মতে "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" বলিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানব্যতীত জীবতত্ত্ব-ভগবতত্ত্বাদির জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতভক্তি বুঝায়। ভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ; ইহা জানিয়া রাখাই ভজনের পক্ষে যথেষ্ট বলা চলে। ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও যদি কেহ নানাবিধ তত্ত্বাদির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে কেবল যে ভজনের অনমুকুল ব্যাপারে তাঁহার সময়ই বৃথা নষ্ট হইবে, তাহাই নহে; ক্রমশঃ তত্ত্বালোচনার দিকে তাঁহার একটা মোহও জন্মিতে পারে। এইরূপ মোহ জন্মিলে তত্ত্বালোচনাকেই তিনি হয়তো তাঁহার ভজনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে মনে করিতে পারেন। তখন এই তত্ত্বালোচনা রীতিমতই তাঁহার ভজনের বিঘ্নজনক হইবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্‌সার সহিত মিশ্রিত যে ভক্তিমার্গের ভজন, তাহাকেই এস্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে ভজনে আবেশ জন্মিতে পারে না বলিয়া জীবেশ্বরের সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা থাকে না। তাই প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন।

উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যায়, রায়রামানন্দ সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আলোচনায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-মূলক জ্ঞানমার্গের সাধনসম্বন্ধে কোনও কথারই অবতারণা করিলেন না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে—

জ্ঞানমার্গের সাধন সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিরোধী, সুতরাং জীব-ব্রহ্মের মধ্যে যে সেব্য-সেবকত্বভাব বিদ্যমান, তাহার স্ফূরণেরও বিরোধী, কাজেই সাধ্যবস্তু যে পরমপুরুষার্থ-প্রেম, সেই প্রেমের আবির্ভাবেরও বিরোধী। প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির কথা বলিলেন, সে সমস্তও তো সম্বন্ধজ্ঞান-স্ফূর্ত্তির অনুকূল নয়; তবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির কথাই বা বলিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞান-স্ফূরণের অনুকূল নহে সত্য; কিন্তু প্রতিকূলও নয়। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য ভক্তির সংস্রব তাঁহাদেরও রাখিতে হয়; কারণ, কর্ম্মফলদাতা হইলেন ভগবান। "ফলমতঃ উপপত্তেঃ ॥ ৩।২।৩৮ ব্রহ্মসূত্র ॥" বিশেষতঃ, ভক্তিবিরোধী জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান তাঁহাদিগকে চিত্তে পোষণ করিতে হয় না। কোনও সময়ে শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদের নষ্ট হয় না।

কিন্তু নিজের উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি যে শ্লোকটী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানবিষয়ক, তাহা শ্রীধরস্বামীর এবং চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতেই বুঝা যায়। তাহাতে মনে হয়, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিকেই রায়রামানন্দ "জ্ঞানমিশ্রা" ভক্তি বলিয়াছেন। অভিধেয়-তত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক সাযুজ্যমুক্তির সাধনেও ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন। এই সাধনের সহায়কারিণী ভক্তি থাকেন তটস্থা হইয়া, তাঁহার কাজ কেবল সাধকের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের চিন্তাকে সাফল্য দান করা; তাঁহার অন্য কোনও কাজ নাই। এই জাতীয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাযুজ্যমুক্তির সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের (সেব্য-সেবক-ভাবের) বিকাশের প্রতিকূল। তাই প্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। গীতার শ্লোক বলে—"ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" পরাভক্তি হইল প্রেমলক্ষণা ভক্তি; ইহাই পরম-পুরুষার্থ; সুতরাং এই পরাভক্তিকে "বাহ্য" বলা চলে না। প্রভু পরাভক্তিকে বাহ্য বলেন নাই; জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকেই বাহ্য বলিয়াছেন। কিন্তু পরাভক্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উক্তশ্লোকের অর্থ করিলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তাৎপর্য্য কি হয়, তাহা বিবেচনা করা দরকার। সাযুজ্যমুক্তির সাধনে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি হইতে যে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে না—অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ ভক্তির সহিত জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জড়িত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই শ্লোকে পরাভক্তি লাভের কথা বলা হইল কেন? চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"মায়িক উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলে সাধক যখন ব্রহ্মভূত (অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য ব্রহ্মরূপ) হয়েন, তখন তিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন (অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় নষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেন না) এবং (বাহ্যানুসন্ধান থাকে না বলিয়া বালকের ন্যায় ভালমন্দ) সকল বস্তুতেই সমদৃষ্টিসম্পন্নও হয়েন। তখন নিরন্ধন অগ্নির ন্যায় (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-) জ্ঞান শান্ত হইয়া গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানসাধনের অন্তর্ভুক্তা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপশক্তির বিলাসভূতা (সুতরাং) অবিনশ্বরা ভক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। পূর্ব্বে মোক্ষ-সাধক-সাধনে সেই সাধনকে সফল করার জন্য অংশরূপে যে ভক্তি বর্ত্তমান ছিল, সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীর ন্যায় তখন তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না। এক্ষণে সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া যাওয়ায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানচিন্তার আর প্রয়োজন বা অবকাশ না থাকায় তাহা যখন শান্ত বা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অবশিষ্ট থাকে কেবল সেই ভক্তি—মাষ-মুদ্গাদির সহিত মিলিত কাঞ্চন-কণিকা প্রথমতঃ অদৃশ্যভাবে থাকিলেও মাষ-মুদ্গাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন নষ্ট হয় না, তাহা যেমন অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ। ভক্তি মায়িক বস্তু নহে বলিয়া নষ্ট হয় না। সাধক তখন সেই ভক্তিকে লাভ করেন। যাহা পূর্ব্বেই ছিল, অন্য বস্তুর (ঐক্যজ্ঞান-চিন্তার) সহিত মিশ্রিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে যাহাকে ততটা লক্ষ্য করা হয় নাই, এখন অন্য বস্তু না থাকায়, কেবল ভক্তিমাত্রই থাকায়, সহজেই তাহাকে পাওয়া যায়। এজন্যই শ্লোকে "অনুষ্ঠান করে"—না বলিয়া "লাভ করে" বলা হইয়াছে। তখন প্রায়শঃ সম্পূর্ণা প্রেমভক্তির লাভ-

সম্ভাবনা হয়। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি"। এইরূপই এই শ্লোক-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তীর উক্তির তাৎপর্য্য।

যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ছিল, পরে স্বতন্ত্রা হইয়াছে, সেই ভক্তির কথাই চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিলেন। রায়রামানন্দ এইরূপ ভক্তিকেই যদি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা বাহ্যই; কারণ, চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, ঈদৃশী ভক্তির ব্যাপারে, সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণা প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা-মাত্র থাকে—তাহাও প্রায়শঃ; নিশ্চয়তার কথা তিনি কিছু বলেন নাই। নিশ্চয়তার কথা না বলার হেতুও আছে। সাধক ব্রহ্মভূত হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের চিন্তা তাঁহার লোপ পাইয়া হয়তো যাইতে পারে; কিন্তু তটস্থা ভক্তি তখন যে প্রবলা হইয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; যদি তাহার নিশ্চয়তাই থাকিত, তাহা হইলে ভক্তির সাহচর্য্যযুক্তা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-চিন্তাকে সাযুজ্য-মুক্তির সাধন বলা হইত না, প্রেমভক্তিলাভের সাধনই বলা হইত। ঐ অবস্থায় তটস্থা ভক্তি প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে—যদি সাধক কোনও পরমভাগবত-মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে। অন্যথা নহে। কিন্তু এইরূপ মহৎ-কৃপা লাভেরও কোন নিশ্চয়তা নাই। এজন্যই বোধহয় চক্রবর্ত্তিপাদ প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা মাত্রের কথা বলিয়াছেন, নিশ্চয়তার কথা কিছু বলেন নাই। নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই ইহা "বাহ্য।"

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।" এবং এই উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতি হইতে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০।১৪।৩॥"-শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন। এই শ্লোকটীর মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানলাভের জন্য কোনও রূপ চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা সাধুদিগের নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের মুখোচ্চারিত ভগবৎ-রূপ-গুণ-লীলাদির কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, স্বতন্ত্র—সুতরাং অপরের পক্ষে অজিত হইলেও ভগবান্ তাঁহাদের বশীভূত হন। এই শ্লোকে জ্ঞান-শব্দের অর্থ—ভগবানের মহিমাদির জ্ঞান, তত্ত্বাদির জ্ঞান। তাহা হইলে রায়রামানন্দ-কথিত "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি" হইল—ভগবানের মহিমাদির, তত্ত্বাদির জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। ভগবানের তত্ত্বাদি না জানিলেও তাহা জানিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র সাধুমুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই সম্বন্ধজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে, প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। ইহাই রায়ের উক্তির এবং উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর॥"

রায় যাহা বলিলেন, তাহা নববিধা ভক্তির অঙ্গ—শ্রবণ। ইহাদ্বারা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়।" এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। যে পরম-রমণীয় শ্রীমন্দিরে সাধ্যবস্তুটী প্রতিষ্ঠিত, তাহার দিকে অগ্রসর হইবার রাস্তায় যেন এতক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছেন, সেই শ্রীমন্দির যেন এতক্ষণে দৃষ্টিপথের গোচরীভূত হইয়াছে, তাই প্রভু বলিলেন—"হাঁ রামানন্দ, জ্ঞানশূন্যাভক্তির কথা যাহা সাধারণভাবে বলিলে, তাহা ঠিক কথাই। বিশেষ করিয়া আরও কিছু বল।"

প্রেমভক্তি। প্রভুর কথা শুনিয়া রায়েরও যেন একটু উৎসাহ জন্মিল। তিনি বলিলেন—"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।" ইহার সমর্থনে দুইটী শ্লোকও বলিলেন, তাহাদের একটীর মর্ম্ম হইতেছে এই যে, ভগবান্ কেবলমাত্র প্রেমই আশা করেন, প্রেমবিরহিত নানাবিধ উপচারেও তিনি প্রীতিলাভ করেন না। আর একটীর মর্ম্ম হইতেছে এই যে, তাই সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় মতিকে, বুদ্ধি-আদিকে কৃষ্ণরস-পরিষিঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে।

রায় যেন এবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে—মন্দিরে আরোহণ করিবার প্রথম সোপানে আনিয়া উপনীত করাইয়াছেন। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর॥"—ঠিকই বলিয়াছ, ইহাও কিন্তু সাধারণ কথা; আরও বিশেষ করিয়া বল। মন্দিরের ভিতরে কি আছে, তাহা যেন এখনও পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি না, তাহা দেখাও।

দাস্যপ্রেম। রায় যেন প্রভুকে নিয়া মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, ইহা যেন একটী চতুস্তল মন্দির। প্রথমে যেন নিম্নতলে প্রবেশ করিলেন, সেখানে যেন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস্যভাবময় নিত্যপরিকরদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহাদের অলভ্য বা অলব্ধ যেন কিছুই নাই। তাঁহাদিগকে দেখাইয়াই যেন রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন—"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

প্রভু যেন দেখিলেন, দাস্যভাবের পরিকরগণ খুব প্রীতির সহিত, খুব আগ্রহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। কিন্তু প্রভুর যেন মনে হইল, মাঝে মাঝে তাঁদের মনে যেন একটু সঙ্কোচ আসে; এই সঙ্কোচের জন্য তাঁরা যেন আশ-মিটাইয়া সেবা করিতে পারিতেছেন না। আরও যেন তাঁহার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবায় খুব আনন্দই পাইতেছেন বটে; কিন্তু যেন প্রাণ-মন মাতানো আনন্দ পাইতেছেন না। তাই যেন প্রভুর মন ততটা প্রসন্ন হইল না। তাই তিনি রামানন্দরায়কে বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর॥"—রামানন্দ, দাস্যপ্রেমসম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা বেশ। কিন্তু ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।

এখানে একটী কথা বলা দরকার। রায়রামানন্দ এস্থলে দাস্যভাবের কথা বলিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তাভাবের কথাও বলিবেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তা—এই চারি ভাবের পরিকর ব্রজেও আছেন, দ্বারকা-মথুরায়ও আছেন। দ্বারকা-মথুরার সকল ভাবের সহিতই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, এই জ্ঞান—মিশ্রিত আছে। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান থাকিলে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়—যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্যপ্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। বাৎসল্য এবং কান্তাভাবও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। (১।৪।১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত। ১।৪।১৬॥" দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি ততটা গাঢ় নয়, যাহাতে প্রীতির আবরণে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ব্রজপরিকরদের কৃষ্ণপ্রীতি এতই গাঢ় যে, তাহার নিবিড় আবরণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, আর তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর—এই অনুভূতি ব্রজে কৃষ্ণ-পরিকরদেরও নাই এবং তাঁহাদের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণেরও নাই। তাঁহারা সকলেই মনে করেন, তাঁহারা মানুষ। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে নরলীলা বলে। প্রেমমুগ্ধত্ববশতঃই এরূপ হয়। প্রেম যতই গাঢ় হয়, ততই এই প্রেমমুগ্ধত্বও গাঢ় হয় এবং প্রেমমুগ্ধত্ব যত নিবিড় হয়, প্রেমের আস্বাদ্যত্বও তত বৃদ্ধি পায়। ব্রজের ভাব শুদ্ধমাধুর্য্যময়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রজেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ; কিন্তু এখানে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা কবলিত, বিমণ্ডিত, সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত। তাই ব্রজের ঐশ্বর্য্য নিজস্ব রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। যখন ঐশ্বর্য্য বিকশিত হয়, মাধুর্য্যবিমণ্ডিত হইয়াই বিকশিত হয়, মাধুর্য্যের রূপ ধরিয়াই প্রকাশ পায়। প্রকাশও পায় কেবল মাধুর্য্যের সেবার নিমিত্ত, মাধুর্য্যের এবং লীলারসের পুষ্টি সাধনের জন্য; যেহেতু, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত। তাই ব্রজের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সঙ্কুচিত হইতে পারে না এবং সঙ্কুচিত হইতে পারে না বলিয়া ব্রজপরিকরদের সেবাবাসনা এবং সেবাও প্রতিহত হইতে পারে না। তাই ব্রজপ্রেম পরম-আস্বাদ্য—দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের কৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা কোটী কোটি গুণে আস্বাদ্য। সাধ্য-তত্ত্ব-বিচারে রায়রামানন্দ ব্রজের দাস্য-সখ্যাদির কথাই বলিতেছেন—তাহাদেরই পরমোৎকর্ষত্ববশতঃ।

ব্রজের যে চারিভাবের ভক্তি দান করার সঙ্কল্প নিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বনিম্নটী হইল দাস্যভাব। রায়রামানন্দ সেই দাস্যভাবের কথাই এস্থলে বলিলেন। এই দাস্যভাবেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভ বলা যায়। আর গীতার শেষ উপদেশ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-শ্লোকে—স্বধর্ম্মত্যাগে পর্য্যবসিত। এইরূপে দেখা যায়, গীতার যেখানে শেষ, তাহারও তিন স্তর পরে—ঊর্দ্ধে—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভ। (স্বধর্ম্মত্যাগের পরে রায়রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি, প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন; তাহার পরে চতুর্থ স্তর দাস্যভক্তির কথা বলিয়াছেন)। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বস্তু বাস্তবিকই সাধারণের পক্ষে দুরবগাহ।

সখ্যপ্রেম। যাহা হউক, ব্রজের দাস্যপ্রেমের কথা শুনিয়াও প্রভু যখন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু থাকিলে তাহা জানিতে চাহিলেন, তখন রায়রামানন্দ যেন প্রভুকে নিয়া মন্দিরের দ্বিতলে উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সুবল-মধুমঙ্গলাদি তাঁহার সখাদের সঙ্গে খুব আপনা-আপনি ভাবে নানাবিধ খেলা খেলিতেছেন। পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সাজাইতেছেন; কখনও বা নিজেদের ছায়ার সঙ্গেই লড়াই করিতেছেন; কখনও বা বকের মত জলের ধারে সকলে মিলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; কখনও বা উড্ডীয়মান পাখীর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছেন; কখনও বা গাছের ডালে উপবিষ্ট বানরের লেজ ধরিয়া টানিতেছেন; একেবারে যেন চঞ্চল নরশিশু। আবার কখনও বা পণ রাখিয়া খেলা করিতেছেন; কোনও সখা খেলায় হারিলে, কৃষ্ণকে কাঁধে করিয়া পণ-অনুসারে তিনি অনেকদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতেছেন; আবার কৃষ্ণ যদি খেলায় হারেন, তাঁহারও কাঁধে চড়িতেছেন, তাঁহার বক্ষেও পাদস্পর্শ হইতেছে। আবার কখনও বা কোনও একটী ফল খাইতে আরম্ভ করিয়া খুব ভাল লাগিলে ঐ উচ্ছিষ্ট এবং লালামিশ্রিত ফলই কৃষ্ণ তাঁহার সখাদের মুখে দিতেছেন—খা ভাই—বলিয়া; আবার সখারাও কৃষ্ণের মুখে গুঁজিয়া দিতেছেন—"খা ভাই কানাই, বড় মিষ্টি ফল।" কাহারও কোনও সঙ্কোচ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সখারা কৃষ্ণকে তাঁহাদের সমান-ই মনে করেন, কোনও অংশেই তাঁহাদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না। জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ আনন্দসত্ত্বামাত্ররূপে যাঁহার অনুভব লাভ করেন, দাস্যভাবের সাধকগণ যাঁহাকে পরমারাধ্য-দেবতারূপে মনে করেন—সুতরাং যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেও সন্ত্রস্ত হন, যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয় এবং অধীশ্বর, লোকপালগণ বহু দূরে থাকিয়া যাঁহার পাদপীঠের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই পরম-ব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এত মাথামাখিভাবে ব্রজরাখালগণ খেলা করিতেছেন—ইহাই যেন শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখিতে পাইলেন।

এই সমস্ত খেলা-ধূলা দেখাইয়াই যেন রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন—"সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥"

প্রভু যেন দেখিলেন—দাস্যভাবের ভক্তগণ যেমন কৃষ্ণগত-প্রাণ, কৃষ্ণছাড়া তাঁরা যেমন আর কিছুই জানেন না, সখারাও তদ্রূপ কৃষ্ণগত-প্রাণ, সখারাও কৃষ্ণছাড়া আর কিছুই জানেন না; দাস্যের ন্যায় সখ্যেও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা আছে; কিন্তু দাস্যে যে একটা সঙ্কোচ আছে, সখ্যে তাহা নাই। কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং সেবা দাস্যে এবং সখ্যে উভয়ই আছে; সখ্যে অধিক আছে সঙ্কোচহীনতা। প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট কিছু আছে কিনা, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতুহল হইল। তাই সখ্যপ্রেমসম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম, আগে কহ আর॥"—রামানন্দ, সখাদের কৃষ্ণপ্রীতি বাস্তবিকই অতি উত্তম। ইহাদের প্রেম এত গাঢ় এবং শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের মমতাবুদ্ধিও এত গাঢ় যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ইহারা নিজেদের মত একজন রাখাল বলিয়া মনে করেন; এবং তাঁদের প্রেমমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণও নিজেকে তাঁদেরই তুল্য একজন রাখালমাত্র মনে করিতেছেন। দাস্যভাবের পরিকরগণও অবশ্য কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানেন না; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ বলিয়া কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের একটা গৌরব-বুদ্ধি আছে; তাই স্বচ্ছন্দ-সেবায় তাঁদের সঙ্কোচ—নিজেদের মুখের উচ্ছিষ্ট ফলটা তাঁহারা কৃষ্ণের মুখে দিতে পারেন না। কিন্তু এই সখাদের মধ্যে দেখিতেছি—কোনওরূপ সঙ্কোচই নাই। স্বচ্ছন্দ-সেবাদ্বারা সখারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতেছেন, কৃষ্ণের সেবাও তাঁরা করিতেছেন, আবার কৃষ্ণকৃত সেবা তাঁরা গ্রহণও করিতেছেন। গোচারণে বা খেলা-ধূলায় ক্লান্ত হইয়া গাছের ছায়ায় কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইতেছেন, পত্রগুচ্ছ লইয়া কৃষ্ণ তাঁদের ব্যজন করিতেছেন, তাঁদের গা-হাত-পা টিপিয়া দিতেছেন। কোনও সঙ্কোচই নাই। কৃষ্ণও যেন একেবারে তাঁদের প্রেমে বশীভূত হইয়া আছেন। সখ্যপ্রেম বাস্তবিকই উত্তম। কিন্তু রামানন্দ, ইহা অপেক্ষাও উত্তম কিছু আছে কি?

"প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর॥" এইবারই সর্ব্বপ্রথম প্রভু "উত্তম" বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা-অপেক্ষা বড় মনে করেন, আর আমাকে তাঁহা-অপেক্ষা ছোট মনে

করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রেমের অধীন হইয়া থাকি। নিজেকে বড় এবং আমাকে ছোট মনে করিতে না পারিলেও যে ভক্ত আমাকে অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, আমি তাঁহার প্রেমেরও অধীন হইয়া থাকি। "আপনাকে বড় মানে, আমারে সমহীন। সর্ব্বভাবে আমি হই তাঁহান্ অধীন॥ ১।৪।২০॥" সখ্যভাবে সমান-সমান ভাব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাদের প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাদিগকে সেবাও করেন, তাঁহাদিগকে নিজের কাঁধে পর্য্যন্ত বহন করেন, তাহাতে তিনি নিরতিশয় আনন্দ অনুভবও করেন। এজন্যই প্রভু "এহোত্তম" বলিলেন। দাস্যে এই মাখা-মাখি ভাব নাই।

বাৎসল্য-প্রেম। যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া রায়রামানন্দ যেন প্রভুকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের ত্রিতলে উঠিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁরা যেন দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন শিশু; নন্দ-যশোদা তাঁহার লালন-পালন করিতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ যশোদার কোলে বসিয়া স্তনপান করিতেছেন; কখনও বা নন্দবাবার পাদুকা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়া অক্ষম দুটী ছোট হাতে বাবার পায়ে পরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, আর নন্দবাবা প্রাণ-গোপালকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বক্ষে তুলিয়া নিয়া সুন্দর কচিমুখে চুমো খাইতেছেন; গোপালও তখন বাবার গালে চুমো দিতেছেন। কখনও বা গোপাল মায়ের দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন, ক্ষীর-নবনী চুরি করিয়া নিজেও খাইতেছেন, কতকগুলি বানরকেও দিতেছেন। মা তাড়না করেন, ভৎর্সনা করেন, কখনও বা উদুখলে বাঁধিয়া রাখেন। "অবোধ শিশু, নিজের ভালমন্দ নিজে জানেনা, বুঝে না। আমি ওর মা; আমি যদি এখনই শাসন করিয়া ইহার সংশোধন না করি, ভবিষ্যতে ইহার বড় অমঙ্গল হইবে।"—এইরূপই যশোদামাতার মনের ভাব।

প্রভু যেন এসব দেখিলেন, দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেন। কি অপূর্ব্ব ভাব! শ্রীকৃষ্ণে নন্দ-যশোদার কত গাঢ় মমত্ব-বুদ্ধি! কি অদ্ভুত বাৎসল্যপ্রেম! শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক তো কাহারও পুত্র নহেন, পুত্র হইতেও পারেন না, তিনি যে অজ, নিত্য, সর্ব্বকারণ-কারণ। তথাপি কত গভীর গাঢ় নন্দ-যশোদায় বাৎসল্যপ্রীতি—যদ্দ্বারা মুগ্ধ হইয়া নন্দ মনে করিতেছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, আর যশোদা মনে করিতেছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা!! তাঁহারা মনে করিতেছেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লালক, পালক, অনুগ্রাহক, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য!!! আর তাঁদের এই শুদ্ধ-বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণও মনে করিতেছেন—তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। মা-যশোদা, নন্দ-বাবা শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। গোপাল তাঁদের জীবন, তাঁদের সব। গোপালেরও ভাব—মা-বাবা না হইলে তাঁহার যেন একমুহূর্ত্তও চলে না। এসব দেখিয়া প্রভু যেন মনে করিলেন—সখাদের প্রেমও গাঢ় বটে, কিন্তু এত গাঢ় নয়—যাতে কোনও অন্যায় দেখিলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভৎর্সন করিতে পারেন। সখ্যের ন্যায় বাৎসল্যেও কৃষ্ণনিষ্ঠা আছে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা আছে, সঙ্কোচাভাব আছে, অধিকন্তু আছে মমত্ববুদ্ধির অধিকতর গাঢ়ত্ববশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে লাল্যত্বের পাল্যত্বের এবং অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজেদের অপেক্ষা হেয়তার জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ যেন নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত অবোধ—এরূপ একটা ভাব। স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার মহিমার অন্ত পান না, যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ধ্যান করিয়াও যাঁহার চরণ-নখ-জ্যোতির আভাসেরও সন্ধান পান না, তিনি এখানে নন্দমহারাজের পাদুকা মস্তকে বহন করিতেছেন, ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্তন্যপানের জন্য মা-যশোদার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। স্বয়ং ভয়ও যাঁহার স্মৃতিতে ভীত হয়, যশোদামাতার তাড়নার ভয়ে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতেছে। যাঁহার শ্রীবিগ্রহ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি যশোদামাতার হাতে বন্ধনপর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিতেছেন। কি অদ্ভুত প্রেমের শক্তি, কি অনীর্ব্বচনীয় ভগবানের প্রেমবশ্যতা।

প্রভু যেন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে যেন আরও কৌতুহল জন্মিল—ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আরও কিছু আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য। তাই বাৎসল্যপ্রেম সম্বন্ধে রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম, আগে কহ আর॥"

কান্তাপ্রেম। প্রভুর কথা শুনিয়া রায়রামানন্দ যেন প্রভুকে লইয়া শ্রীমন্দিরের চতুর্থ তলে উঠিয়া গেলেন। উঠিয়া তাঁহারা যেন দেখিলেন—পরম-মনোরম একটী বন। তাহাতে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। প্রতি বৃক্ষ লতাজালে পরিবেষ্টিত। প্রতি লতায় কত সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত। মধুলুব্ধ কত ভ্রমর কুসুমোপরি গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোকিল-পাপীয়ার পঞ্চম তানে বন মুখরিত। মৃদু পবন কুসুমের গন্ধসম্ভার বহন করিয়া লতাজালকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছে। সমস্ত বন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। বনের মধ্যে একটী বিস্তীর্ণ চত্বর, যেন সবুজ মকমলে ঢাকা। তাহার মধ্যস্থলে এক কিশোর মূর্ত্তি। কি অপূর্ব্ব তাঁর দেহের বর্ণ—নীলোৎপল হার মানিয়া যায়। কি অপূর্ব্ব সুগন্ধ সেই দেহ হইতে সব দিকে বিস্তারিত হইতেছে—মৃগমদ এবং নীলোৎপলের মিলিত গন্ধও তার নিকটে পরাজিত। ঈষদ্‌বিকশিত ওষ্ঠদ্বয়ে কি সুন্দর প্রাণ-মাতান স্নিগ্ধোজ্জ্বল মন্দহাসি ; আর সেই আকর্ণবিস্তৃত লালিমাভ নয়নদ্বয়ে কি সুন্দর চাহনি—যেন সমগ্র বিশ্বকে ঐ চাহনির দিকে টানিয়া নিতেছেন। কিশোর মূর্ত্তি অধরে একটা বাঁশী ধরিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। কপাল এবং গণ্ডদ্বয় অলকা-তিলকায় সজ্জিত। নাসায় মুক্তার নোলক দুলিতেছে ; কর্ণদ্বয়ে মণিরত্ন-খচিত কুণ্ডল—গণ্ডদ্বয়ের নীলাভ জ্যোতিতে যেন ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। মস্তকে পত্র-পুষ্পের মুকুট—তাতে ময়ূর-পুচ্ছ। বাহুতে ফুলের অঙ্গদ, ফুলের বালা। নীলাকাশে বক-পাঁতির ন্যায় বক্ষে মুক্তার হার। গলায় নানারকমের ফুলের মালা—এক ছড়া মালা খুব লম্বা, যেন চরণদ্বয়কে চুম্বন করার জন্য লালায়িত। পরিধানে পীত ধটী। চরণে নানামণিখচিত সোনার নূপুর—নখচন্দ্রের শোভাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেন রুণু রুণু ধ্বনি তুলিয়া তার জয়গান করিতেছে।

সেই কিশোরের বামপার্শ্বে এক নবীনা কিশোরী—যেন অমিয়ায় ছানা ঘন বিজুরীতে গড়া। অনুরূপই তাঁর বসনভূষণ, হাব-ভাব। মূর্ত্ত প্রেম। তাঁহাদের ঘেরিয়া অসংখ্য ব্রজ-কিশোরী—যেন অনন্ত-প্রেম-বৈচিত্রীর—সৌন্দর্য্য-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত প্রকাশ। প্রাণের অন্তস্তল হইতে প্রীতিরসের উৎস প্রবাহিত করিয়া ইঁহারা কিশোর-যুগলের প্রীতিসম্পাদনের জন্য ব্যস্ত। এমন আপন-ভোলা সেবা আর কোথাও দেখা যায় না। নিজেদের সুখ-দুঃখের, ইহকাল-পরকালের কোন অনুসন্ধানই ইঁহাদের নাই। ইঁহাদের সমস্ত বাসনা, সমস্ত চেষ্টা ঐ কিশোর-যুগলের সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে ঘেরিয়া।

নবীন-কিশোরের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী যিনি, তাঁহার নাম শ্রীরাধা ; তিনি এই ব্রজ-কিশোরীদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা, সকল বিষয়ে তিনি ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই নবীনা কিশোরীবৃন্দ যেন তাঁরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁর নবীন-কিশোরের সেবায় তাঁর সহায়কারিণী। ইঁহারা—শ্রীরাধাও—চাহেন কেবলমাত্র সেই নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণের সুখ ; তজ্জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—সমস্তই অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহারা করিতে পারেন, করিতেছেন। তাঁদের প্রাণবল্লভ সেই নবকিশোর নটবরের জন্য তাঁরা সকলেই বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, দেহ, গেহ, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্ত মলবৎ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁদের সেবায় দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালন—সবই আছে ; অধিকন্তু আর একটী জিনিস আছে, যাহা অন্যত্র নাই—স্বীয় অঙ্গদ্বারা পর্য্যন্ত সেবা। প্রেমবতী কান্তা প্রেমবান্‌ কান্তাকে যে ভাবে সেবা করে, ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা তদপেক্ষাও প্রীতিময়ী। কত রকমই বা ইঁহাদের প্রীতিবিকাশের ভঙ্গী, আর কত রকমই বা শ্রীকৃষ্ণেরও প্রেম-বিকাশের ভঙ্গী। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর-কণ্ঠালিঙ্গিতবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা গান করিতেছেন, কখনও বা পরস্পরকে ফুলসজ্জায় সাজাইতেছেন, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেছেন। আবার কখনও বা মান-অভিমান চলিতেছে। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারম্‌" বলিয়া অভিমানিনী শ্রীরাধার পদপ্রান্তে ভূমিতে লুটাইতেছেন। সমস্তেই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ যেন এক আনন্দের মহাবন্যায় নিমগ্ন হইয়া সাঁতার দিতেছেন।

প্রভু যেন সমস্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আছেন। এ সময় রায় রামানন্দ বলিলেন—প্রভু "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এস্থলে দু'চারিটী কথা বলা দরকার। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদিগকে মানুষী বলিয়া মনে করিলেও স্বরূপতঃ তাঁরা জীবতত্ত্ব নহেন। (সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাগণ এবং নন্দ-যশোদাদিও জীবতত্ত্ব নহেন)। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীরাধা স্বয়ং হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী। স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিজস্ব-শক্তি বলিয়া তত্ত্বতঃ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াত্ব সম্বন্ধ এবং শ্রীজীবাদি বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে অপ্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তারূপেই তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ অভিমান বা দৃঢ়প্রতীতি। কিন্তু লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের অনুরোধে প্রকট-ব্রজলীলায় তাঁহাদের পরকীয়া-অভিমান। তাঁহাদের ভাব হইল স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব। পরকীয়া নায়িকার পক্ষে অভীষ্ট নাগরের সহিত মিলনের পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক। "কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" যখন মিলনের সুযোগ থাকে না, তখন মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; তাহার ফলে মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে রসপুষ্টির সহায়তা হয়। শ্রীকৃষ্ণসেবার বলবতী উৎকণ্ঠায় স্বজন-আর্য্যপথ-বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি প্রীতির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণও বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া (কৌমার অবস্থাতেই পরনারীর সহিত মিলিত হওয়াতে)—তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী প্রভাবও সূচিত হইতেছে। এই সম্পর্কে আর একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে এইরূপ মিলন অবৈধ হইলেও কোনও পক্ষেরই স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও ইহাতে নাই; পরস্পরের প্রীতিসম্পাদনই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখোক্তি। তাঁহাদের এই মিলনে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনের ন্যায় জুগুপ্সিত কাম-ক্রীড়াও নাই। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ ব্যাপার—তাঁহাদের ভিতরের উদ্বেলায়মান প্রেমের নির্বাধ-উল্লাসের বহির্ব্বিকাশের দ্বারমাত্র; প্রাকৃত কামক্রীড়ার ন্যায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদিই তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। (গৌররূপে শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগাবতারে সঙ্কীর্ত্তনরূপ দ্বার দিয়াই এই প্রেম বিকশিত এবং আস্বাদিত হইয়াছে)। ইহাদের লীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহা হইলে আজন্ম-বিরক্ত শ্রীশুকদেব-গোস্বামী রাসলীলা বর্ণনান্তে বলিতেন না যে, ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এসমস্ত ক্রীড়ার কথা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা শ্রবণ বা বর্ণন করেন, শীঘ্রই তাঁহারা পরাভক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয় (বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯॥); এবং পারলৌকিক-মঙ্গলকামী আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতও এসকল কথা শ্রবণ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন না। আর, পরম-ভাগবত উদ্ধব-মহাশয়ও ব্রজসুন্দরীদের চরণ-রেণু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বৃন্দাবনে তৃণগুল্ম হইয়া জন্মলাভের সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেন না (আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১॥) এবং তাঁহাদের হরিকথোদ্‌গীতকেও ত্রিভুবন-পাবন বলিতেন না (বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥)।

ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের আর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা কোনওরূপ অপেক্ষার ধার ধারে না। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের প্রত্যেকেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন—দাসদের প্রভু, সখাদের সখা, পিতা-মাতার পুত্র। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বিকাশ এই সম্বন্ধের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাঁহাদের সেবা সম্বন্ধের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাই দাস্যভাবের পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফল দিতে পারেন না, সখারা শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন-ভর্ৎসন করিতে পারেন না; যশোদামাতাও সন্তানের প্রতি মাতা যাহা করিতে পারেন, তদতিরিক্ত কোনও সেবা করিতে পারেন না। তাঁদের বেলায় সম্বন্ধ আগে, তারপর সেবা—তাঁদের প্রীতির বিকাশ হইবে সম্বন্ধের অনুগতভাবে; তাই তাঁদের কৃষ্ণরতিকে বলে সম্বন্ধানুগা রতি। কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের বেলায় অন্যরূপ। তাঁদের কৃষ্ণপ্রীতি আগে, তারপর সেবা—প্রীতির

প্রেরণায়। তাই তাঁদের কৃষ্ণরতিকে বলে প্রেমানুগা। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য যখন যাহা করা দরকার, তখন তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন; কোনও কিছুরই অপেক্ষা নাই। এই প্রীতির উচ্ছ্বাসেই তাঁহারা বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদিও ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। প্রীতির প্রবল বন্যায় বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদির বাধা কোন্ দূর-দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে—প্রবল স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায়। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিতে সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে, তাই লোক-ধর্ম্মাদির অপেক্ষাও আছে। এই সম্বন্ধের উচ্চপ্রাচীরে দাস-সখাদির সেবা-বাসনা প্রতিহত হইয়া আসে। ব্রজ-সুন্দরীদের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা প্রীতিবাসনার বিকাশে কোনও বাধা জন্মাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদের কান্ত-কান্তা সম্বন্ধ হইল তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতির বা কৃষ্ণসেবাবাসনার অনুগত। যথাপ্রয়োজন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সুযোগ পাওয়ার জন্যই তাঁদের এই সম্বন্ধ। তাই তাঁদের প্রীতির বিকাশ সকল সময়েই অবাধ, অপ্রতিহত। তাঁহাদের প্রীতির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনের কথাদি সমস্তই তাঁহারা জানিতে পারেন। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥ আদিপুরাণ॥—হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগত ভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন; অন্য কেহ তাহা জানেন না।" তাই গোপিকারাই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে পারেন এবং এজন্যই কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে॥ ২।৮।৬৯॥" আর প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ এই কান্তাপ্রেমেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ ২ ৮।৬৯॥" গীতায় অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। আমাকে যিনি যেভাবে ভজন করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করি"। কিন্তু গোপীদের ভজনে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে; তিনি তাঁহাদের সেবার অনুরূপ সেবা করিতে পারেন না। তাই তিনি নিজমুখেই তাঁদের নিকটে নিজের চিরঋণিত্ব স্বীকার করিয়া স্পষ্টকথায় বলিয়াছেন—"ন পারয়েহহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা, ১০।৩২।২২—হে গোপীগণ! দুশ্চেদ্য গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। আমাদের সহিত তোমাদের যে মিলন, তাহা অনিন্দ্য। দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতএব তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হউক।" এরূপ ঋণিত্ব আর কোনও পরিকরের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, যিনি পরব্রহ্ম পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্, তিনি কিনা গোপ-কিশোরীদের নিকটে নিজেকে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন! নিরুপাধি প্রেমের কি অনির্ব্বাচ্য, অচিন্ত্যনীয় প্রভাব! যাহা পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত যেন "তৃণাদপিসুনীচ"-ভাব ধারণ করায়। তাই, শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী।" এতাদৃশী গরীয়সী হইতেছে গোপিকাদের কৃষ্ণপ্রীতি। তাঁদের মতন নিগূঢ় প্রেম-ভাজনও শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই; একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥ আদিপুরাণ॥—হে পার্থ! গোপীগণ তাঁহাদের নিজের দেহকেও আমার (আমাতে অর্পিত আমার সুখসাধন) বস্তুজ্ঞানে (মার্জ্জনভূষণাদিদ্বারা) যত্ন করেন। এতাদৃশী গোপিকাগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেহ নাই।"

গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতি প্রেমবিকাশের চরম-স্তরে গিয়া উঠিয়াছে। এই স্তরের নাম মহাভাব। দ্বারকা-মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের কান্তা; কিন্তু এই মহাভাব তাঁদের পক্ষেও সুদুর্লভ। "মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ।" এই মহাভাবের একটী স্বভাব এই যে, ইহা মহাভাববতীদিগের দেহেন্দ্রিয়াদিকে নিজের স্বরূপতা—মহাভাবতা—প্রাপ্ত করায়; "স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ।" মহাভাব হইল হ্লাদিনীর সারভূত বস্তু—সুতরাং স্বরূপতঃই পরম-আস্বাদ্য। ব্রজসুন্দরীদের সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি মহাভাব-রূপতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহারাও পরম-আস্বাদ্য। তাই তাঁদের তিরস্কারও রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরম-আস্বাদ্য। "প্রিয়া যদি মনে করি করয়ে ভৎসন।

বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ ১।৪.২৩ ॥" চিনি স্বরূপতঃই মিষ্ট ; চিনি দ্বারা যদি একটা নিমফল তৈয়ার করা হয়, তাহা হইলে তাহা দেখিতে তিক্ত নিমফলের মত হইলেও, তাহার স্বাদ মিষ্টই হইবে। তদ্রূপ ব্রজসুন্দরীদের তিরস্কারের রূপটী তিক্ত—অপ্রীতিকর—হইলেও মহাভাবেরই বৈচিত্রীবিশেষ বলিয়া তাহার আস্বাদন পরম-লোভনীয়। পরমাস্বাদ্য-মহাভাবরূপ হৃদয় হইতে মহাভাবরূপ মুখ দিয়া মহাভাবের তরঙ্গে পরিনিষিক্ত হইয়া যাহা বিকশিত হয়, তাহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতা মহাভাবেরই ন্যায় অনির্ব্বচনীয়। তিরস্কারকেও পরম আস্বাদ্য করিয়া তোলে যে প্রেম, সেই প্রেমের মধুরিমা যে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

ব্রজদেবীদের প্রেমের কৃষ্ণবশীকারিতার কথা বলিয়া রায়রামানন্দ তাহার আর একটী অদ্ভুত কথাও বলিলেন, তাহা এই। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য স্বভাবতঃই "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" কিন্তু তিনি যখন ব্রজদেবীদিগের সঙ্গে থাকেন, তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবে সেই মাধুর্য্য আরও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যায়। "যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য। ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥ ২।৮।৭২ ॥"

গীতার সর্ব্বশেষ উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন। সেই সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া পরম-সার্থকতা লাভ করিয়াছে একমাত্র গোপীপ্রেমেই, অন্যত্র কোথাও নয়।

কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে এসমস্ত জানিয়া প্রভু রামরায়কে বলিলেন—"এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥" প্রভুর পিপাসা এখনও চরমাতৃপ্তিলাভ করে নাই। রামানন্দরায়ের প্রকাশ-চাতুর্য্যে সূর্য্যোদয়ে কমলের ন্যায় বিষয়টী যেন স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হইতেছে—স্তরে স্তরে। রায়ের রস-পরিবেশন-পরিপাট্যও অপূর্ব্ব।

রাধাপ্রেম। প্রভুর কৌতূহল বুঝিয়া রামানন্দ বলিলেন—"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥"

রায়ের কথা শুনিয়া, রাধাপ্রেমের মহিমার কথা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু যেন একটা আপত্তি উত্থাপন করিবার সূচনা করিয়া বলিলেন—"আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে। অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥"

এইরূপ সূচনা করিয়া স্পষ্টভাবেই প্রভু আপত্তিটী জানাইলেন। বলিলেন—রায়, তুমি যে বলিতেছ, রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি ; কিন্তু তাহার প্রমাণ যেন জাজ্বল্যমানরূপে পাওয়া যাইতেছে না। রাধাপ্রেমের মহিমা যদি সর্ব্বাতিশায়ীই হইবে, তবে কেন শ্রীকৃষ্ণ "চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ রাধালাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥" এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। কথা হইতেছে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) সম্বন্ধে। শ্রীরাধার প্রেম অন্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে—ইহা যদি প্রভু বলিতেন, তাহা হইলেই যেন তাঁহার আপত্তিটী প্রকরণসঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি প্রশ্ন তুলিলেন—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গাঢ়তা সম্বন্ধে—রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ গাঢ় নয় ; যেহেতু, তাহার এই অনুরাগ এত প্রবল নয়, যাহাতে তিনি গোপীদিগের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্যত্র যাইতে পারেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর প্রশ্নটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। এই প্রশ্নটী না তুলিলে রাধাপ্রেমের মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত হইত কিনা সন্দেহ। যে বস্তুটী প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয় তাহার প্রভাব দেখিয়া। জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়—দেহের উপরে তাহার প্রভাবদ্বারা, জ্বর দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পরিমাণ দ্বারা জ্বরের পরিমাণ জানা যায়। শ্রীরাধার প্রেমও দেখিবার বস্তু নয়। এই প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহা জানিতে হয়। ঝঞ্ঝাবাতের গতিবেগ জানা যায় যেমন গাছের দোলানীর পরিমাণ দ্বারা, তদ্রূপ, রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তের দোলানীর পরিমাণের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক

রাধাপ্রেমরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অনুরাগসমুদ্রকে এমনভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদি এই অনুরাগসমুদ্রে এইরূপ উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, যাহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রীতি-বিকাশের পথে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে, সর্ব্ববিধ অন্যাপেক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় তীব্রবেগে বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে রাধাপ্রেমের প্রভাব—মহিমা—সর্ব্বাতিশায়ী। প্রভু বলিলেন—কিন্তু তাতো নয়। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের অপেক্ষা রাখেন।

রামানন্দরায় অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। রসের বৈচিত্রীবিশেষ প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে, কিম্বা অন্য কোনও কারণে শ্রীরাধাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে তিনি অন্য গোপীর অপেক্ষা রাখেন—সময়ে সময়ে এইরূপ দেখা যাইতে পারে। সকল সময়েই যদি তাঁহার এইরূপ অন্যাপেক্ষা দৃষ্ট হইত, যদি কোনও সময়েই তাঁহার ব্যবহারে অন্যাপেক্ষা-হীনতা দেখা না যাইত, তাহা হইলেই বুঝা যাইত যে, তিনি কিছুতেই অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহা হইলেই বুঝা যাইত—শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করিতে সমর্থ নয়। কিন্তু তাহা নয়। জয়দেব-বর্ণিত বসন্তরাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রায়রামানন্দ প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই শ্রীরাধার উদ্দেশ্যে—তাঁহাদের প্রত্যক্ষভাবেই—তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বিষয়টী এই। শতকোটি গোপসুন্দরীর সঙ্গে বসন্তরাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক রাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত আছেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্নসূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল। রাসলীলা রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ আর যেন বহিতেছেনা। কেন এমন হইল? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—রাসমণ্ডলীতে রাসেশ্বরীই নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না; যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন না—আমি শ্রীরাধার খোঁজে যাইতেছি; তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

যত যত স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের যত যত লীলা আছে, এমনকি ব্রজেও শ্রীকৃষ্ণের যত যত লীলা আছে, তৎসমস্তের মধ্যে রাসলীলাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী। একথা তিনিই নিজমুখে বলিয়াছেন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥ বৃহদ্‌বামন॥"—আমার অনেক মনোহারিণী লীলা আছে বটে; কিন্তু রাসের কথা মনে হইলে আমার মন যে কিরূপ হয়, তাহা বলিতে পারি না।" এতাদৃশী রাসলীলার সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী হইলেন শ্রীরাধা; তাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্র শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলিরাছেন এবং শ্রীল জয়দেবগোস্বামী শ্রীরাধাকে—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাসলীলার বাসনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষে—শৃঙ্খলসদৃশা বলিয়াছেন। "কংসারেরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলা—কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সম্যকরূপে সারভূত-বাসনাকে (রাসলীলার বাসনাকে) আবদ্ধ করিয়া রাখিবার শৃঙ্খলরূপা। তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসলীলার বাসনাও থাকেনা।" শতকোটি গোপী বিদ্যমান থাকিতেও শ্রীরাধাব্যতীত রাসলীলা নির্ব্বাহিত হইতে পারেনা, ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাধিক্য প্রমাণিত হইতেছে।

রায়ের মুখে এই বিবরণ শুনিয়া, রাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী মহিমা উপলব্ধি করিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি প্রীতিগদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে রামানন্দকে বলিলেন—"যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।"

কিন্তু যদিও প্রভু মুখে বলিলেন—"এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।", তাঁহার কৌতুহল যেন তখনও উপশান্ত হয় নাই। তাই তিনি আবার রায়কে বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" মনে হয়, রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধেই তিনি আরও কিছু জানিতে চাহেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন যেন অন্য কথা।

তিনি বলিলেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ কহ, রাধিকা-স্বরূপ। রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥" এই প্রশ্ন শুনিলে মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ত্ব এবং রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে প্রভু যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই যেন জানা হইয়া গিয়াছে; এখন যেন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতত্ত্বসম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। রায়রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে চাহিলেন; উদ্দেশ্য যেন—রাধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব। রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে একটী মাত্র প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করিলেন। বসন্তরাসের দৃষ্টান্তে রায় তাহার সমাধান করিলেন। সেই সমাধানে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৌতুহল তখনও রহিয়া গিয়াছে। তাই তিনি কেবল বলিলেন—এক্ষণে "সাধ্যের নির্ণয় জানিলাম।" কিন্তু "রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি—তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম।"—একথা প্রভু বলিলেন না। এক্ষণে তিনি রাধাপ্রেমের মহিমাকে বিকশিত করার জন্য প্রকাশ্যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন না করিয়া একটী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কৌশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায়। আর এক স্তবক বিকশিত হইবে বিলাস-তত্ত্বের জিজ্ঞাসায়।

যে-কৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেম সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে-কৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করাইয়াছে, সেই কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিলে রাধাপ্রেমের মহিমা সম্যক্‌রূপে জানা যাইতে পারে না। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

যে-রাধার প্রেম কৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তত্ত্ব না জানিলেও তাঁহার প্রেমের মহিমা সম্যক্ জানা যাইতে পারে না। তাই রাধাতত্ত্বসম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

আর যে প্রেমের এমন প্রভাব, সেই প্রেমের তত্ত্ব—সেই প্রেম স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা না জানিলেও তাহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারে না। তাই প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না; যেহেতু, এই রাধাপ্রেমের প্রভাবেই রসত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ এবং রাধাপ্রেমের দ্বারাই সেই রসের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব। তাই রসতত্ত্বসম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

রায়রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে সমস্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত-বৈকুণ্ঠ এবং অনন্ত অবতারের আধার। কত বড় বিরাট তত্ত্ব! অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। এতাদৃশ বস্তুকে যে প্রেম সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে পারে, সে প্রেমের মহিমা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়।

রসতত্ত্ব। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আর একটা দিকের কথা বলিলেন—রসের দিক। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর। শ্রুতির "রসো বৈ সঃ।" রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ বলিয়া সর্ব্বশক্তির প্রভাবে তিনি সর্ব্বরসপূর্ণ, অখিল-রসামৃত-বারিধি, সমস্ত রসের বিষয় এবং আশ্রয়। বিভুতত্ত্ব হইয়াও রসাস্বাদন করিবার এবং করাইবার জন্য, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান সচ্চিদানন্দ-তনু। অজ, নিত্য, শাশ্বত হইয়াও, সর্ব্বকারণ-কারণ হইয়াও বাৎসল্যপ্রেমের বশে তাঁহার ব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বের অভিমান। আস্বাদ্যরসরূপে নিত্য-নবায়মান আস্বাদ্য-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া, সকলের চিত্তে তাহার আস্বাদনের জন্য বলবতী লালসা এবং তজ্জনিত পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তিনি সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলেন; তাই তিনি "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।" এবং "পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥" ব্রজদেবীদিগের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যবৃদ্ধির হেতু। শ্রীরাধায় প্রেমবিকাশের চরম-পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তাঁহার মাধুর্য্যবিকাশেরও পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥"

শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, তখন শ্রীরাধার প্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য—উভয়েই যেন জেদাজেদি করিয়া বাড়িতে থাকে, কেহই যেন আর কাহারও নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না। মাধুর্য্যের এই চরম-বিকাশেই শ্রীকৃষ্ণ মদন-মোহন—"সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।" যাঁহার মোহিনী-শক্তির এক কণিকার আভাস মাত্র পাইয়া প্রাকৃত মদন সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই অপ্রাকৃত মদনও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এবং তাঁহার রসত্বের অত্যধিক বিকাশই সূচিত হইতেছে এবং এই অত্যধিক বিকাশের হেতুও শ্রীরাধার প্রেম। ইহাও রাধাপ্রেমের মহিমাব্যঞ্জক।

সমস্ত রসের মধ্যে মধুররস বা শৃঙ্গাররসই সকল বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রসত্বের বিকাশে শ্রীকৃষ্ণ যেন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসরূপে বিরাজিত। "শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তিধর।" শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিত্বের বিকাশ এবং সার্থকতা এবং তাহাতেই তিনি "লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" ইহাতেও রাধাপ্রেম-মহিমার অসাধারণত্ব সূচিত হইতেছে।

এস্থলেই রায়রামানন্দ রসতত্ত্বের কথা বলিলেন এবং রাধাপ্রেমের মহিমাতেই যে রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসত্বের চরম বিকাশ, ভঙ্গীতে তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

প্রেমতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্ব। ইহার পরে রায়-মহাশয় রাধাতত্ত্ব এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রেমতত্ত্বের কথাও বলিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব যেমন একই বস্তু, স্বরূপতঃ রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বও একই বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী হইল হ্লাদিনী—আনন্দস্বরূপা—আনন্দদায়িকা শক্তি। এই হ্লাদিনীর সার বা ঘনীভূত অবস্থার নামই প্রেম; তাই প্রেম পরম-আস্বাদ্য। "রতিরানন্দরূপৈব। ভ, র, সি,।" হ্লাদিনীর এই আনন্দ—আস্বাদ্যত্ব—হইল চিদানন্দ, চিন্ময় এবং পরম-আস্বাদ্য বলিয়া তাহাও রসস্বরূপ। তাই প্রেমের আর একটী নাম—"আনন্দচিন্ময় রস।" প্রেমের এই আনন্দ—চিদ্‌বস্তু বলিয়া স্বপ্রকাশ; তাই ইহা নিজেকেও প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে; নিজেকেও নিজে আস্বাদন করিতে পারে, অপরের মনেও আস্বাদন-বাসনা জাগাইতে পারে এবং অপরের দ্বারা নিজেকে আস্বাদন করাইতেও পারে। ইহাই প্রেমের সাধারণ তত্ত্ব।

প্রেমের পরম-সারকে—চরম-গাঢ়তাপ্রাপ্ত প্রেমকে—বলে মহাভাব। এই মহাভাব সমস্ত ব্রজদেবীগণেই বিরাজিত; অপর কোনও কৃষ্ণপরিকরে মহাভাব নাই। মহাভাবেরও চরমতম বিকাশের—গাঢ়তার চরমতম-পরাকাষ্ঠার—নাম হইল মাদনাখ্য-মহাভাব। এই মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারও মধ্যেই নাই—অপর ব্রজদেবীগণেও না। আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া আত্মারাম, স্বরাট্, পূর্ণতমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও মত্ততা জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার নাম মাদন। এই মাদন-শব্দই মাদন-ভাববতী শ্রীরাধার প্রেমের অসাধারণ মহিমা সূচিত করিতেছে। এই মাদনেই প্রেমতত্ত্বের চরমতম বিকাশ।

শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব—মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা, মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ এবং মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রীও। তাঁহার স্বরূপই মহাভাব। ভগবান্ এবং তাঁহার বিগ্রহ যেমন একই অভিন্ন বস্তু, যে-ই বিগ্রহ, সে-ই যেমন ভগবান এবং যে-ই ভগবান, সে-ই যেমন বিগ্রহ (অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ৩।২।১৪॥ ব্রহ্মসূত্র), তদ্রূপ, মহাভাব এবং শ্রীরাধা—উভয়ই এক এবং অভিন্ন বস্তু। মহাভাবই শ্রীরাধার বিগ্রহ।" প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমবিভাবিত।" শ্রীরাধা মহাভাব-ঘনবিগ্রহা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন আনন্দঘন বস্তু, শ্রীরাধাও তেমনি প্রেমঘন বস্তু। শ্রীরাধার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই ঘনীভূত-মহাভাব দ্বারা গঠিত—মহাভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত নয়, মহাভাবের স্বরূপতাপ্রাপ্ত নয়—মহাভাবই, মহাভাব দ্বারা গঠিতই।

মহাভাব হইল কান্তাভাবের প্রেম। শ্রীরাধা যখন মহাভাব-স্বরূপা, তাঁহার প্রেমও যখন বিকাশের চরম-তম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, তখন সহজেই বুঝা যায়, তিনি "কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা।"

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কান্তারসের অশেষ-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্য নিজেই ললিতাদি-সখীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং-ভগবান, শ্রীরাধাও তেমনি স্বয়ং-কান্তাপ্রেম। রসবৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত-কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীরাধাও অনন্ত কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখিল-রসামৃতসিন্ধু, শ্রীরাধাও তেমনি অখণ্ড-রসবল্লভা।

শ্রীরাধা স্বয়ংপ্রেমস্বরূপা হওয়াতেই তাঁহার প্রেমের-অসাধারণ মহিমা।

বিলাস-মহত্ত্ব। রায়ের মুখে প্রভু রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শুনিলেন। শুনিয়া—অখণ্ড-রসবল্লভা মহাভাববিগ্রহা স্বয়ং-কান্তাপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত অখিল-রসামৃতবারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ সাক্ষাৎ-মন্মথ-মদন শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসে রাধাপ্রেম-মহিমার যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হইতে পারে, সম্ভবতঃ তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই তিনি রায়কে বলিলেন—"শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিয়া রায় বলিলেন—"কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।" এবং ধীরললিতত্বের ব্যঞ্জনা কি, তাহাও বলিলেন। প্রেয়সীদিগের প্রেমের বশীভূত হইয়া এবং সর্ব্বাধিকরূপে শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তাঁহাদের সহিত লীলাবিলাস-সুখে নিমগ্ন থাকেন। রায় আর কিছু বলিলেন না। শ্রীরাধাপ্রেমের মহা-আকর্ষকত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণবশীকরণবিষয়ে তাহার মহাসামর্থ্যের ব্যঞ্জনা জানাইয়াই রায়মহাশয় নীরব হইলেন।

প্রভুর কৌতূহল কিন্তু এখনও নিবৃত্তি লাভ করে নাই। তিনি বলিলেন—"এই হয়, আগে কহ আর।"—রামানন্দ, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা বেশ, অতি চমৎকার। কিন্তু আরও কিছু আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়, বিলাস সম্বন্ধে আরও কিছু বল।

রায় যেন বিস্মিত হইয়াই বলিলেন—"ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর। যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥"—প্রভু, আমার মুখে কৃপা করিয়া তুমি যাহা প্রকাশ করাইয়াছ, তাহার উপরে তো আমার বুদ্ধির গতি নাই। তবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে তোমার কৃপায় আমার সামান্য যাহা একটু অনুভব লাভ হইয়াছে, আমার রচিত একটী গীতে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আছে। জানি না, তাহা শুনিয়া তুমি সুখ পাইবে কিনা; তথাপি আমি তাহা ব্যক্ত করিতেছি। এইরূপ বলিয়া রায়মহাশয় সুর-তান-লয় যোগে স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত গীতটী গান করিলেন।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন। দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি॥

গানটী শ্রীরাধার উক্তি। গানের "না সো রমণ না হাম রমণী"—পদে প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের ইঙ্গিত। বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ পরিপক্ক অবস্থা (শ্রীজীব) এবং বিপরীত (চক্রবর্ত্তী)। উভয় অর্থই এস্থলে গ্রহণ করা যায়। পরিপক্ক অবস্থার ফলে বৈপরীত্য। প্রেমের চরম-পরিপক্ক অবস্থায় পুনঃ পুনঃ মিলনেও মিলনবাসনার অতৃপ্তিবশতঃ মিলনের জন্য যে বলবতী উৎকণ্ঠা, তাহার ফলে বাস্তব মিলনেও যে স্বপ্নবৎ প্রতীতি, নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি এবং বৈপরীত্যজ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক। একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিষয়টীর আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না।

যাহা হউক, গীতটী শুনিয়া প্রেমোল্লাসবশতঃ প্রভু স্বহস্তে রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। আর মুখে বলিলেন—"সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে প্রভুর পিপাসা সম্যক্‌রূপে উপশান্ত হইল। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে রাধাপ্রেম-মহিমার যে পরিচয় পাইলেন, তাহাই চরমতম সাধ্যবস্তু বলিয়া প্রভু স্থির করিলেন—জীবের কথা তো দূরে, অনন্ত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত ভগবৎ-পরিকর আছেন, তাঁহাদের কথাও দূরে; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞানকে পর্য্যন্ত যাহা স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে, সেই প্রেমের আশ্রয় যে তাঁহার ব্রজপরিকরগণ, তাঁহাদের মধ্যেও ইহা অপেক্ষা উন্নততর সাধ্যবস্তুর কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। তাই প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।"

সাধন। ইহার পরে প্রভু সাধনসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। "সাধ্যবস্তু সাধনবিনু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥"

প্রভু যে সাধনের প্রসঙ্গ তুলিলেন, সেই সাধন জীবের। যে রাধাপ্রেমকে প্রভু "সাধ্যবস্তুর অবধি" বলিলেন, তাহা নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধায় বিদ্যমান। ইহা তাঁহার কোনওরূপ সাধনের ফল নহে। রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি হইলেও সাধনের প্রভাবে কেহ তাহা পাইতে পারে না। ইহা প্রেমবিকাশের সর্ব্বোপরিতন স্তর মাদনাখ্যমহাভাব। অন্যের কথা দূরে, অন্য ভগবৎ-পরিকরদের কথাও দূরে, অন্য ব্রজদেবীগণেরও ইহা দুর্লভ। জীবের কথা আর কি বলা যাইবে।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। দাসের সেবা সর্ব্বদাই আনুগত্যময়ী—রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবাই জীব পাইতে পারে। কিরূপ সাধনে জীব "সাধ্যবস্তুর অবধি"-রূপ রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবা পাইতে পারে, তাহাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীরাধার প্রেমের বিকাশও হয় লীলাতে। রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবার অবকাশও লীলাতেই। কিন্তু শ্রীরাধার সখীগণ ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের লীলায় অন্য কাহারও অধিকার নাই। "সবে এক সখীগণের ইহঁা অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ সখীবিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ সখীবিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।" সখীগণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে এই লীলার সেবা দিয়া থাকেন, তিনিই তাহা পাইতে পারেন; অন্যের পক্ষে এই সেবা একান্ত সুদুর্লভ। তাই, "সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

সখীভাবে সখীদের আনুগত্যে ভজন করিতে হইবে। সখীভাবে অর্থ—"আমি নিজে শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপা এক গোপকিশোরী"—এইরূপ ভাব। কিঙ্করী বলিয়া যে গৌরব-বুদ্ধি-আদিদ্বারা সেবাবুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, তাহা নয়; সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচাভাব—শ্রীরাধার সখীস্থানীয়া গোপসুন্দরীদিগের আনুগত্যে স্বচ্ছন্দে প্রাণমন-ঢালা সেবা। ইহাই "সখীভাবে" শব্দের ব্যঞ্জনা।

ইহাকে রাগানুগা-ভজন বলে। এই ভজনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকেনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-জ্ঞান হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাগানুগার ভজন আরম্ভই হয় না। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভই এই সাধনের প্রবর্ত্তক। রাগানুগা-ভজন একটী পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

রাধাপ্রেমের (কান্তাভাবের) আনুগত্যময়ী সেবা জীবের পক্ষে সাধ্যবস্তুর অবধি হইলেও সকলেই যে এই সেবা প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হয়, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। তাই রুচিভেদে দাস্যভাব, সখ্যভাব এবং বাৎসল্যভাবের আনুগত্যময়ী সেবার অনুকূল ভজনও দৃষ্ট হয়। এসমস্ত ভাবের ভজনও রাগানুগা-ভজন। যিনি যে ভাবের সেবা চাহেন, তিনি—শ্রীকৃষ্ণের সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যেই ভজন করিয়া থাকেন। ব্রজের কোনও ভাবের ভজনেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে ব্রজভাবের সেবা পাওয়া যায় না। নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার না করিলেও ব্রজভাবের ভজন সার্থক হয় না।